11575 - মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রশ্ন

আপনি কি আমাকে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিতে পারবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

বনি ইসরাইল পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হল। তারা তাদের আকিদা ও শরীয়তে পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটাল। ফলে সত্য অস্পষ্ট হয়ে গেল, বাতিল প্রকাশ পেল এবং যুলুম ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। তখন উম্মতের এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন হলো যা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে, বাতিলকে মিটিয়ে দেবে এবং মানুষকে সরল পথের দিকে পরিচালিত করবে। আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“আমি আপনার কাছে এই কিতাব নাযিল করেছি কেবল এই জন্য যে, তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে, আপনি তাদের সেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবেন; আর এটি ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ।”[সূরা নাহল: ৬৪]

আল্লাহ সকল নবী ও রাসূলকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন নূহ আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষে হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

“আমি প্রত্যেক জাতির কাছে এই দাওয়াত দিয়ে একজন রাসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত (মিথ্যা উপাস্য) থেকে দূরে থাকো।”[সূরা নাহল: ৩৬]

সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই। আল্লাহ বলেন:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

‘মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয় (তার কোনো বয়স্ক ছেলে নেই), বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।’[সূরা আহযাব: ৪০]

প্রতিটি নবীকে কেবল তাঁর নিজ জাতির জন্য প্রেরণ করা হতো, কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

‘আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।’[সূরা সাবা: ২৮]

আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর কুরআন নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে পথ দেখাবেন এবং তাদের রবের অনুমতিতে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনবেন। আল্লাহ বলেন:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“(এটি) একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি; যাতে আপনি মানুষকে তাদের রবের হুকুমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, অর্থাৎ মহাপরাক্রমশালী ও সর্বময় প্রশংসার মালিকের (আল্লাহর) পথে নিয়ে আসতে পারেন।’[সূরা ইবরাহিম: ১]

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব আল-হাশিমি আল-কুরাইশি মক্কায়, হস্তির বছর জন্মগ্রহণ করেছেন, যে বছর হস্তিবাহিনী কাবা ধ্বংস করতে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাঁর জন্মের আগেই মায়ের গর্ভে থাকার সময় তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মাদ জন্মের পর হালিমা সাদিয়া তাঁকে দুধ পান করান। এরপর তিনি তাঁর মা আমিনা বিনতে ওয়াহাবের সাথে মদিনায় তাঁর মামাদের কাছে যান। মক্কায় ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে তাঁর মা ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। এরপর তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর দায়িত্ব নেন। কিন্তু মুহাম্মাদের বয়স আট বছর হলে তিনিও ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন এবং চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁকে আদর-যত্নে রাখেন ও তাঁর পক্ষে সুরক্ষা দেন। আবু তালিব মুহাম্মাদের দ্বীনে বিশ্বাস না এনেই ইন্তেকাল করেন। কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে কুরাইশরা তাকে পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগের জন্য তিরস্কার করবে।

শৈশবে মুহাম্মাদ মক্কাবাসীদের মেষ চরাতেন। এরপর তিনি খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদের ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে শামে (বর্তমান সিরিয়াতে) সফর করেন। ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা হয়। খাদিজা তাঁর চরিত্র, সততা ও আমানতদারিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। খাদিজা জীবিত থাকা পর্যন্ত তিনি

আর কোনো বিবাহ করেননি।

আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তমভাবে গড়ে তুলেছিলেন এবং উত্তম শিষ্টাচারে তাঁকে সুশিক্ষিত করেছিলেন। তিনি তাঁকে লালন-পালন করেছেন ও জ্ঞান দান করেছেন, যাতে তিনি তাঁর কওমের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী, সর্বোচ্চ মনুষ্যত্বের প্রতীক, সর্বাধিক ধৈর্যশীল, সর্বাধিক সত্যবাদী এবং সর্বোচ্চ আমানতদার হন। এমনকি তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে 'আল-আমিন' (বিশ্বস্ত) উপাধি দিয়ে।

এরপর নির্জনতা তাঁর কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি হেরা গুহায় দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত একা থেকে ইবাদত করতেন এবং তাঁর প্রতিপালককে ডাকতেন। মূর্তি, মদ ও অশ্লীলতার প্রতি তাঁর ঘৃণা জন্মে এবং তিনি সারাজীবন এগুলোর দিকে ফিরেও তাকাননি।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন কুরাইশদের সাথে কাবা পুনর্নির্মাণে অংশ নেন। কারণ বন্যার কারণে কাবার ক্ষতি হয়েছিল। হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপনের বিষয়ে যখন গোত্রগুলোর মধ্যে বিবাদ দেখা দিল, তখন সবাই তাঁকে বিচারক মনোনীত করল। তিনি একটি কাপড় আনিয়ে তাতে পাথরটি রাখলেন এবং সব গোত্রের নেতাদের কাপড়ের কোণ ধরতে বললেন। তারা সবাই মিলে পাথরটি উঠিয়ে নিয়ে গেল এবং মুহাম্মাদ নিজে সেটি যথাস্থানে স্থাপন করলেন। সবাই সন্তুষ্ট হলো এবং বিবাদের অবসান হলো।

জাহেলী যুগের লোকদের মধ্যে কিছু প্রশংসনীয় গুণ ছিল। যেমন: দানশীলতা, বিশ্বস্ততা ও সাহসিকতা। তাদের মধ্যে ইবরাহিমের ধর্মের কিছু অবশিষ্টাংশও ছিল, যেমন: কাবাকে সম্মান করা, তাওয়াফ, হজ, উমরা ও কুরবানি পেশ করা। কিন্তু এর পাশাপাশি তাদের মধ্যে অনেক নিন্দনীয় চরিত্র ও অভ্যাস ছিল, যেমন: ব্যভিচার করা, মদ পান করা, সুদ খাওয়া, কন্যাসন্তান হত্যা করা, যুলুম করা এবং মূর্তিপূজা করা।

ইবরাহিমের দ্বীন পরিবর্তন করে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু করেছিল আমর ইবনে লুহাই আল-খুযাঈ। সেই মক্কাতে ও অন্যান্য স্থানে মূর্তি নিয়ে এসেছিল এবং মানুষকে মূর্তিপূজার দিকে আহ্বান করেছিল। এসব মূর্তির মধ্যে ছিল: উদ্দ, সুওয়াআ, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরা।

এরপর আরবরা আরও অনেক মূর্তি তৈরি করে। এর মধ্যে ছিল কুদাইদে 'মানাত' মূর্তি, তায়েফে 'লাত', নাখলা উপত্যকায় 'উয্যা' এবং কাবার ভেতরে 'হুবাল'। কাবার চারপাশে ও ঘরে ঘরে মূর্তি ছিল। মানুষ গণক ও জাদুকরদের কাছে বিচার-ফায়সালার জন্য যেত।

এইভাবে যখন শিরক ও অন্যায় ছড়িয়ে পড়ল, তখন আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চল্লিশ বছর বয়সে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার এবং মূর্তিপূজা ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান নিয়ে। কুরাইশরা তাঁকে

অস্বীকার করল এবং বলল:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

‘সে কি বহু উপাস্যকে এক উপাস্য বানিয়ে ফেলতে চায়? এ তো এক অদ্ভুত ব্যাপার।’[সূরা সাদ: ৫]

এসব মূর্তি আল্লাহর পরিবর্তে পূজিত হতে থাকল, যতদিন না আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাওহীদ (একত্ববাদ) নিয়ে পাঠালেন। তখন তিনি এবং তাঁর সাহাবীরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম সেগুলো ভেঙে ধ্বংস করে দিলেন এবং সত্য প্রকাশিত হলো, বাতিল মিটে গেল:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

‘বলুন: সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা অবলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা অবলুপ্ত হওয়ারই কথা।’[সূরা বনি ইসরাইল: ৮১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বপ্রথম ওহি নাযিল হয় হেরা গুহায়, যেখানে তিনি ইবাদত করতেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে এসে তাঁকে পড়তে বললেন। রাসূল বললেন: ‘আমি পড়তে জানি না।’ জিবরাইল তাঁকে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিলেন। তৃতীয়বার বললেন:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

“পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে। পড়ুন, আর আপনার প্রভু পরম বদান্য।”[সূরা আলাক্ব: ১-৩]

রাসূল কম্পিত হৃদয়ে ফিরে এলেন এবং তাঁর স্ত্রী খাদিজার কাছে গিয়ে সব কথা জানালেন এবং বললেন, “আমি নিজের জন্য আশঙ্কা বোধ করছি।” খাদিজা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: “আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনো আপনাকে লজ্জিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমদের বোঝা বহন করেন, অতিথিদের আপ্যায়ন করেন, নিঃস্বকে উপার্জন করে দেন এবং সত্যের দুর্যোগে সাহায্য করেন।” এরপর তিনি তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে গেলেন, যিনি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনা শুনে তিনি সুসংবাদ দিলেন এবং বললেন: “এটি সেই নামুস (ঐশী বার্তাবাহক জিবরাইল) যাকে আল্লাহ মূসার কাছে পাঠিয়েছিলেন।” তিনি তাঁকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন এবং বললেন যে কওম তাঁকে কষ্ট দেবে ও দেশ থেকে বের করে দেবে।

এরপর কিছুকালের জন্য ওহী বন্ধ থাকে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। একদিন তিনি হাঁটছিলেন, হঠাৎ আবার ফেরেশতাকে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে দেখতে পেলেন। তিনি ঘরে ফিরে চাদরে গা মুড়ে দিলেন। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنذِرْ

“হে চাদরাবৃত, উঠুন এবং সতর্ক করুন।”[সূরা মুদ্দাসসির: ১-২] এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে ওহী নাযিল হতে থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় তেরো বছর অবস্থান করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন; প্রথমে গোপনে, তারপর প্রকাশ্যে। আল্লাহ যখন তাঁকে সত্য কথা প্রকাশ্যে বলতে নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি যুদ্ধ ছাড়া কোমলতা ও নম্রতা দিয়ে মানুষকে ডাকলেন। তিনি প্রথমে তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করলেন, তারপর তাঁর কওমকে, তারপর আশপাশের লোকদেরকে, তারপর সমগ্র আরবদেরকে এবং তারপর সমগ্র বিশ্বকে। এরপর আল্লাহ বললেন:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

‘অতএব তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।’[সূরা হিজর: ৯৪]

রাসূলের প্রতি স্বল্প সংখ্যক ধনী, সম্ভ্রান্ত, দুর্বল, দরিদ্র ও দাস, নারী ও পুরুষ ঈমান আনে। তারা সকলে তাদের ধর্মের জন্য কষ্ট ভোগ করে। কাউকে নির্যাতন করা হয়, কাউকে হত্যা করা হয় এবং কেউ কেউ কুরাইশদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে হাবশায় হিজরত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কষ্টের সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেন, এমনকি আল্লাহ তাঁর ধর্মকে বিজয়ী করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন পঞ্চাশ বছর এবং নবুওয়তের দশ বছর অতিবাহিত হয়ে তখন তাঁর চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন, যিনি তাঁকে কুরাইশদের কষ্ট থেকে রক্ষা করতেন। তাঁর পরেই ইন্তেকাল করেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা, যিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। তখন তাঁর সম্প্রদায়ের অত্যাচার আরও বেড়ে যায় এবং তারা তাঁর বিরুদ্ধে আরো উদ্ধত হয়ে উঠে এবং বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়া শুরু করে। তিনি ধৈর্য ও সওয়াবের আশায় সব সহ্য করে যান। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যখন অত্যাচার তীব্র হলো এবং কুরাইশরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে চলল, তখন তিনি তায়েফে যান এবং সেখানকার অধিবাসীদের ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে বরং তাঁকে কষ্ট দিল এবং পাথর ছুঁড়ে মারল, এমনকি তাঁর গোড়ালি থেকে রক্ত ঝরাল। অতঃপর তিনি মক্কায় ফিরে এলেন এবং হজ ও অন্যান্য সুযোগে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে থাকলেন।

এরপর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে রাতের বেলা মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করালেন। তিনি বোরাকে সওয়ার ছিলেন এবং জিবরাইল তাঁর সাথে ছিলেন। সেখানে নেমে তিনি নবীদের সাথে নামাজ পড়লেন। তারপর তাঁকে প্রথম

আকাশে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে তিনি আদম আলাইহিস সালামকে দেখলেন এবং তাঁর ডান পাশে সৌভাগ্যবানদের আত্মা ও বাম পাশে হতভাগ্যদের আত্মা দেখলেন। তারপর দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে ঈসা ও ইয়াহইয়া আলাইহিমাস সালামকে দেখলেন। তারপর তৃতীয় আকাশে, সেখানে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখলেন। তারপর চতুর্থ আকাশে, সেখানে ইদ্রিস আলাইহিস সালামকে দেখলেন। তারপর পঞ্চম আকাশে, সেখানে হারুন আলাইহিস সালামকে দেখলেন। তারপর ষষ্ঠ আকাশে, সেখানে মূসা আলাইহিস সালামকে দেখলেন। তারপর সপ্তম আকাশে, সেখানে ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে দেখলেন। এরপর সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তাঁর প্রভু তাঁর সাথে কথা বললেন এবং তাঁকে সম্মানিত করলেন। তাঁর ও তাঁর উম্মতের উপর দিনে রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করলেন। তারপর কমিয়ে কার্যতঃ পাঁচ ওয়াক্ত এবং সওয়াবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত করা হলো। উম্মতে মুহাম্মাদিকে সম্মান করে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ স্থির হলো। তারপর ভোর হওয়ার আগেই তিনি মক্কায় ফিরে এলেন এবং সব ঘটনা বললেন। ঈমানদারেরা বিশ্বাস করল, আর কাফিরেরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“পবিত্র সেই সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলা মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন, যার চারপাশ আমি বরকতময় করেছি, যাতে তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাই। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।”[সূরা ইসরা: ১]

তারপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য সাহায্যকারীদের ব্যবস্থা করলেন। হজের মৌসুমে মদিনার খাযরাজ গোত্রের একদল লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করল। তারপর তারা মদিনায় ফিরে ইসলাম প্রচার করল। পরের বছর তারা পনেরো জনেরও বেশি হয়ে এলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে মিলিত হলেন এবং তাদেরকে কুরআন পড়াতে ও ইসলাম শেখাতে তাদের সাথে মুসআব ইবনে উমাইরকে পাঠালেন। তাঁর হাতে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করল, যার মধ্যে আওস গোত্রের নেতা সাদ ইবনে মুআয ও উসাইদ ইবনে হুদাইর ছিলেন।

পরের বছর হজের মৌসুমে আওস ও খাযরাজ থেকে সত্তরেরও বেশি লোক মক্কায় এলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদিনায় আমন্ত্রণ জানালেন, কারণ মক্কাবাসীরা তাঁকে বয়কট করেছিল ও কষ্ট দিয়েছিল। রাসূল তাদের সাথে তাশরিকের কোনো এক রাতে ‘আকাবা’-র কাছে দেখা করার ওয়াদা করলেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হল তখন তারা নির্ধারিত স্থানে গেলে এবং সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলে, তাঁর সাথে তাঁর চাচা আব্বাস ছিলেন। আব্বাস তখনও ঈমান আনেননি, কিন্তু ভাতিজার বিষয়টিতে উপস্থিত থাকতে চেয়েছিলেন। তখন আব্বাস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও উপস্থিত লোকেরা সুন্দর আলোচনা করলেন। এরপর রাসূল এই শর্তে তাদেরকে বায়আত করালেন যে তিনি হিজরত করে মদিনায় গেলে তারা তাঁকে আশ্রয় দেবে, সাহায্য করবে ও প্রতিরক্ষা দিবে; আর এর বিনিময়ে তারা

জান্নাত পাবে। তখন একে একে সবাই বায়আত করল। তারপর তারা চলে গেলে। কুরাইশরা তাদেরে বিষয়টি জেনে গেলে এবং তাদেরেকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু আল্লাহ তাদেরেকে রক্ষা করলনে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপযুক্ত সময় পর্যন্ত মক্কায় থেকে গেলেনে:

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

'আল্লাহ অবশ্যই তাদেরে সাহায্য করবনে যারা তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।'[সূরা হজ: ৪০]

তারপর রাসূল সাহাবীদেরকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশে দিলিনে। তারা দলে দলে হিজরত করতে লাগলনে। মুশরিকরা যাদেরেকে আটকে রেখেছেলি তারা ছাড়া আর কেউ মক্কায় রইলনে না। মক্কায় মুসলমানদেরে মধ্যে শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও আলী রইলনে। রাসূলেরে সাহাবীদেরে মদিনায় হিজরতেরে বিষয়টি মুশরিকরা বুঝতে পরেে আশঙ্কা করল যে রাসূলও তাদেরে সাথে মিলিতি হবনে এবং তাঁর শক্তি বেড়ে যাবে। তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। জিবরীল রাসূলকে বিষয়টি জানালনে। তখন রাসূল আলীকে নির্দেশে দিলিনে তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকতে এবং মানুষেরে যসেব আমানত রাসূলেরে কাছে ছিলি সগেুলো ফিরিয়ে দিতি। মুশরিকরা রাসূলকে বরে হওয়ার সাথে সাথে হত্যা করার জন্য তাঁর দরজার কাছে রাত কাটাচ্ছিলি। কিন্তু, রাসূল তাদেরে মাঝ দিয়িইে বেরিয়ে গেলেনে। আল্লাহ তাঁকে তাদেরে ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার পর তিনি আবু বকরেরে বাড়িতি গেলেনে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ নাযলি করলনে:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

'স্মরণ করুন, যখন কাফরিরো আপনাকে বন্দি করার জন্য অথবা হত্যা করার জন্য কিংবা (মাতৃভূমি থেকে) বরে করে দেওয়ার জন্য আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলি। তারা ষড়যন্ত্র করছিলি এবং আল্লাহ (তাদেরে ষড়যন্ত্রেরে বিরুদ্ধে) কৌশল করছিলিনে। আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী।'[সূরা আনফাল: ৩০]

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করার সংকল্প করলনে। তিনি ও আবু বকর রওনা হয়ে সাওর গুহায় গেলেনে এবং তিনিরাত সখোনে থাকলনে। তারা আবদুল্লাহ ইবনে আবী আরীকতিকে পথপ্রদর্শক হিসিবে ভাড়া করলনে এবং তাঁর কাছে তাদেরে উটনী দুটো সোপর্দ করলনে। সে মুশরিকি ছিলি। কুরাইশরা ঘটনা জেনে সব জায়গায় তাদেরে খুঁজতে লাগল, কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসূলকে রক্ষা করলনে। খোঁজাখুঁজি কিছুটা শান্ত হওয়ার পর তারা মদিনার পথে রওনা হলনে। কুরাইশরা যখন তাদেরেকে পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ পয়েে পড়ল তখন ঘোষণা করল যে কেউ তাদেরে কাউকে বা উভয়কে ধরে আনতে পারবে তাকে দুইশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে। তখন লোকেজন উৎসাহেরে সাথে তাদেরেকে খুঁজতে লাগল। মদিনার পথে সুরাকা ইবনে মালকি (যে মুশরিকি ছিলি) তাদেরে সন্ধান পয়েে পিছিনে ধাওয়া করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে দোয়া করলনে। ফলে তার ঘোড়ার পা মাটতিে দেবে গেলে। সে বুঝল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লাহর হেফাজতে আছেন। সে রাসূলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং অনুরোধ করল যেন তার জন্য দোয়া করা হয় ও তাকে কোনো ক্ষতি না করা হয়। রাসূল তার জন্য দোয়া করলেন এবং সে ফিরে গেল এবং তাদেরকে খোঁজা থেকে মানুষকে সরিয়ে দিল। পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ের পর সে ইসলাম গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পৌঁছালেন, তখন তাঁর আগমনে মুসলমানরা আনন্দে ‘তাকবীর’ ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। নারী, পুরুষ ও শিশুরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি ‘কুবা’ নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং সেখানে তিনি ও মুসলমানরা মিলে ‘কুবা মসজিদ’ নির্মাণ করেন। সেখানে তিনি দশ রাতের কিছু বেশি সময় অবস্থান করেন। এরপর জুমআর দিন তিনি সওয়ার হন এবং ‘বনু সালিম বিন আউফ’ গোত্রে জুমআর নামাজ আদায় করলেন। এরপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন। মানুষ তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল এবং তাঁর উষ্ট্রীর লাগাম ধরতে চাইল যেন তিনি তাদের কাছে অবস্থান গ্রহণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন: ‘উটকে ছেড়ে দাও, কারণ এটি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আদিষ্ট।’ উষ্ট্রীটি চলতে থাকল এবং অবশেষে বর্তমান মসজিদে নববীর জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য তাঁর মামাদের বাড়িতে মসজিদের সন্নিকটে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং তিনি আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে উঠলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে তাঁর পরিবার-পরিজন, কন্যাগণ এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন এবং তাঁরা মদীনায় চলে এলেন।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীরা সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ শুরু করলেন যেখানে উষ্ট্রীটি বসেছিল। তিনি মসজিদের কিবলা ‘বাইতুল মাকদিসের দিকে নির্ধারণ করলেন। মসজিদের খুঁটি ছিল খেজুর গাছের কান্ড এবং ছাদ ছিল খেজুরের ডাল ও পাতা দিয়ে তৈরি। মদীনায় আসার কয়েক মাস পর কিবলা কাবার দিকে পরিবর্তন করা হয়।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করলেন। তিনি ইহুদীদের সাথে শান্তি ও মদীনা রক্ষার ব্যাপারে একটি লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। ইহুদীদের প্রধান আলেম আব্দুল্লাহ বিন সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু অধিকাংশ ইহুদী কুফরী করতে থাকে। সেই বছরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

দ্বিতীয় হিজরিতে আযান প্রবর্তিত হয়, আল্লাহ কিবলা কাবার দিকে পরিবর্তন করেন এবং রমজানের রোজা ফরয করেন।

যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় স্থিত হলেন এবং আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করলেন, মুহাজির ও আনসাররা তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন এবং সকলের হৃদয় তাঁর ওপর ঐক্যবদ্ধ হলো, তখনই মুশরিক, ইহুদী এবং মুনাফিকরা একজোটে হয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে শুরু করল। তারা তাঁকে কষ্ট দিল, তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটাল এবং যুদ্ধের ঘোষণা দিল।

কিন্তু আল্লাহ তাঁকে ধৈর্য ও ক্ষমার আদেশ দিতে থাকলেন। যখন তাদের জুলুম চরম সীমায় পৌঁছাল এবং তাদের অনিষ্ট বেড়ে গেল, তখন আল্লাহ মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন এবং এই আয়াত নাজিল করলেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

‘যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো হচ্ছে, তাদেরকে (আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হলো; কারণ তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে (মযলুম মুমিনদেরকে) সাহায্য করতে সক্ষম।’[সূরা হজ: ৩৯]

এরপর আল্লাহ মুসলমানদের ওপর সেইসব কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফরয করলেন যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করত। আল্লাহ বলেন:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

‘আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।’[সূরা বাকারা: ১৯০]

অতঃপর আল্লাহ মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

‘আর তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করো যেভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে।’[সূরা তাওবা: ৩৬]

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহর পথে দাওয়াত ও জিহাদে আত্মনিয়োগ করলেন, আক্রমণকারীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করলেন এবং মযলুমদের থেকে যুলুম দূর করলেন। আল্লাহ তাঁর সাহায্যে তাঁকে শক্তিশালী করলেন এবং অবশেষে দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি হিজরি দ্বিতীয় বছরে রমজান মাসে বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে লড়াই করেন এবং আল্লাহ তাঁদের ওপর তাঁকে বিজয় দান করেন ও শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দেন। তৃতীয় হিজরিতে বনু কাইনুকার ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং একজন মুসলমানকে হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মদীনা থেকে সিরিয়ার দিকে বহিষ্কার করেন। এরপর কুরাইশরা বদরের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে জড়ো হয়। সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, কিন্তু তীরন্দাজ বাহিনী রাসূলের আদেশ অমান্য করার কারণে পূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়নি এবং মুশরিকরা মদীনায় প্রবেশ না করেই মক্কায় ফিরে যায়।

এরপর বনু নাদ্বীর গোত্রের ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথর ছুড়ে

হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেন। চতুর্থ হিজরিতে তিনি তাদেরকে অবরোধ করেন এবং খাইবারে বহিষ্কার করেন।

পঞ্চম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুস্তালিকের আক্রমণ প্রতিহত করতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং বিজয়ী হন। এরপর ইহুদী নেতারা মদীনা থেকে ইসলাম নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন গোত্রকে উস্কানি দেয়। মদীনার চারপাশে মুশরিক, হাবশী, গাতফান এবং ইহুদীরা একত্রিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাহায্য করেন:

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

‘আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্রোধ নিয়েই ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। যুদ্ধে (সাহায্য করার) জন্য মুমিনদের পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ মহা শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।’[সূরা আহযাব: ২৫]

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইযার ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তাদেরকে অবরোধ করেন। আল্লাহ তাঁদের উপরও তাঁকে বিজয় দান করেন। ফলে তাদের পুরুষদের হত্যা করা হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হয় এবং তাদের সম্পদ গনীমতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ষষ্ঠ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ যিয়ারত করা ও তাওয়াফ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মুশরিকেরা তাঁকে বায়তুল্লায় পৌঁছতে বাধা দেয়। অবশেষে হুদায়বিয়াতে তাদের সাথে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধের সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। যাতে এ সময় মানুষ নিরাপদে থাকে এবং স্বাধীনভাবে ধর্ম বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়। যার ফলে দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে।

সপ্তম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার অভিযান পরিচালনা করেন। যাতে করে যেসব ইহুদী নেতারা মুসলমানদের কষ্ট দিয়েছিল তাদের নির্মূল করা যায়। তিনি তাদেরকে অবরোধ করে রাখেন এবং আল্লাহ তাঁকে তাদের উপর বিজয়ী করেন। তাদের সম্পদ ও জমি গনীমত হিসেবে হস্তগত করেন। এরপর তিনি বিশ্বের বিভিন্ন রাজাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠান।

অষ্টম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আক্রমণকারীদের শায়েস্তা করার জন্য যায়েদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী পাঠান। কিন্তু রোমানরা বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করে এবং মুসলিম সেনাপতিরা শহীদ হন। আল্লাহ অবশিষ্ট মুসলিমদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন।

এরপর মক্কার কাফেরেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে সন্ধি ভঙ্গ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং মক্কা বিজয় করেন। তিনি আল্লাহর প্রাচীন ঘর কাবাকে মূর্তি মুক্ত

করেন এবং কাফেরদের কর্তৃত্ব মুক্ত করেন।

অষ্টম হিজরির শাওয়াল মাসে সাকিফ ও হাওয়াযিন গোত্রের আক্রমণ প্রতিহত করতে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করেন এবং মুসলমানেরা প্রচুর গনীমত লাভ করে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তায়েফকে অবরোধ করেন। তবে তখনো তায়েফ বিজয় করার অনুমতি আসেনি। তাই তিনি তাদের জন্য দোয়া করে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তিনি গনিমত বণ্টন করেন, উমরা সম্পন্ন করেন এবং মদীনায় ফিরে আসেন।

নবম হিজরিতে অভাব ও তীব্র গরমের সময় 'তাবুক যুদ্ধ' সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমানদের চক্রান্ত নস্যাৎ করতে তাবুকে যান এবং সেখানে অবস্থান করেন। কোনো সরাসরি যুদ্ধ হয়নি। তিনি কিছু গোত্রের সাথে সন্ধি করেন এবং গনিমত নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এটিই ছিল তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ। সেই বছর বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রতিনিধি দল পাঠায়, যার মধ্যে বনু তামীম, তাঈ, আব্দুল কায়েস এবং বনু হানিফা অন্যতম। তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হাজীদের নেতৃত্ব দিয়ে মক্কায় পাঠান এবং তাঁর সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠিয়ে সূরা 'বারাআত' (তাওবা) পাঠ করার নির্দেশ দেন যেন মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানানো হয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরবানির দিন ঘোষণা করেন: "হে লোকেসকল! কোনো কাফের জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এই বছরের পর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না, কেউ উলঙ্গ হয়ে কাবা তওয়াফ করতে পারবে না এবং যার সাথে রাসূলের চুক্তি আছে তা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহাল থাকবে।"

দশম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজের সংকল্প করেন এবং মানুষকে হজ করার আহ্বান জানান। মদীনা ও বাইরে থেকে অসংখ্য মানুষ তাঁর সাথে হজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'যুল-হুলাইফা' থেকে ইহরাম বাঁধেন এবং যিলহজ মাসে মক্কায় পৌঁছান। তিনি তাওয়াফ ও সাঈ করেন এবং মানুষকে হজের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেন। আরাফাতের ময়দানে তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, যেখানে ইসলামের ইনসাফপূর্ণ বিধানগুলো প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বলেন:

"হে লোকেসকল, আমার কথা শোনো। কারণ আমি জানি না এরপর আর কোনো বছর তোমাদের সাথে আমার দেখা হবে কি না। হে মানুষ! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য হারাম (পবিত্র), যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর। জেনে রাখো, জাহেলিয়াত আমলের সবকিছু আমার পায়ের নিচে পদদলিত হলো (বাতিল হলো)। জাহেলিয়াত আমলের রক্তের দাবি বাতিল করা হলো। আর আমাদের বংশের প্রথম রক্ত যা আমি বাতিল করছি তা হলো ইবনে রাবিয়া বিন হারিসের রক্ত। জাহেলি যুগের সুদ বাতিল করা হলো এবং আমাদের বংশের প্রথম সুদ যা আমি বাতিল করছি তা হলো আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানতের মাধ্যমে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থানকে

হালাল করেছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে বসতে দিবে না যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা সেটি করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে মৃদু প্রহার করবে। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হচ্ছে তোমরা যথাযথভাবে তাদেরকে খাবার ও পোশাক দিবে। আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব। আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা কী বলবে?" সাহাবীগণ বললেন: "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন।" এরপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুললেন এবং মানুষের দিকে ইশারা করে তিনবার বললেন: "হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।"

যখন আল্লাহ এই ধর্মকে পূর্ণতা দিলেন এবং এর মূলনীতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন আরাফাতের ময়দানে তাঁর ওপর নাযিল হলো:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'[সূরা মায়িদা: ৩]

এই হজকে 'বিদায় হজ' বলা হয় কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন এবং এরপর আর হজ করেননি। হজ শেষে তিনি মদীনায় ফিরে যান।

একাদশ হিজরির সফর মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। যখন তাঁর কষ্ট বেড়ে গেল, তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নামাজে ইমামতি করার নির্দেশ দিলেন। রবিউল আউয়াল মাসে তাঁর রোগ আরও বৃদ্ধি পায়। একাদশ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার পূর্বাহ্নে তিনি ইন্তেকাল করেন। এতে মুসলমানরা অত্যন্ত শোকাভিভূত হন। মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গোসল করানো হয় এবং জানাযা শেষে আয়েশার রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গিয়েছেন কিন্তু তাঁর ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এরপর মুসলমানরা তাঁর গুহার সঙ্গী এবং হিজরতের সহচর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করেন। তাঁর পরে ওমর, এরপর উসমান এবং এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরাই হলেন 'খোলাফায়ে রাশেদীন' (সঠিক পথপ্রাপ্ত খলিফাগণ)।

আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মহান নেয়ামত দান করেছেন এবং তাঁকে মহান চরিত্রের উপদেশ দিয়েছেন:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا

تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)

‘তিনি কি তোমাকে এতিম অবস্থায় পাননি? অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি তোমাকে পথহারা অবস্থায় পেয়ে পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি তোমাকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় পেয়ে অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হবে না। যাচনাকারীকে ধমক দেবে না। আর তোমার রবের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ্যে বলো।’[সূরা দুহা: ৬-১১]

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এমন মহান চরিত্র দান করেছেন যা অন্য কারো মাঝে একত্রে দেখা যায় না, এমনকি স্বয়ং আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

‘নিশ্চয়ই তুমি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।’[সূরা কলম: ৪]

এই মহান চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণের মাধ্যমেই তিনি তাঁর রবের অনুমতিক্রমে মানুষের মন জয় করতে পেরেছিলেন:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

‘আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠিনহৃদয় হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে যেত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করো। যখন তুমি সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তার উপর) ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।’[সূরা আলে ইমরান: ১৫৯]

আল্লাহ তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র মানবজাতির জন্য পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ওপর কুরআন নাজিল করেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

‘হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল এক প্রদীপ হিসেবে।’[সূরা আহযাব: ৪৫-৪৬]

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অন্যান্য নবীদের ওপর ছয়টি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন যেমনটি তিনি বলেছেন: ‘আমাকে ছয়টি বিষয় দ্বারা অন্যান্য নবীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে: আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য (জাওয়ামিউল কালিম) দান করা হয়েছে, ভীতি (শত্রুর মনে) দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, গনিমত আমার জন্য হালাল করা হয়েছে, সমগ্র

জমিনকে আমার জন্য পবিত্র ও সিজদার জায়গা করা হয়েছে, আমাকে সমগ্র মানবজাতির কাছে পাঠানো হয়েছে এবং আমার মাধ্যমে নবীদের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।’[হাদীসটি মুসলিম (৫২৩) বর্ণনা করেন]

তাই জান্নাতে প্রবেশের জন্য সকল মানুষের উচিত তাঁর ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর আনীত শরীয়ত অনুসরণ করা:

مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাদেরকে এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটিই বিরাট সাফল্য।’[সূরা নিসা: ১৩]

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন এবং দুই বার পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়েছেন:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ
مُسْلِمِينَ (53) أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

‘কুরআনের আগে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে ঈমান আনে। যখন তাদের কাছে এটি (কুরআন) পাঠ করা হয়, তারা বলে: আমরা এতে ঈমান এনেছি, এটি আমাদের রবের পক্ষ থেকে আগত সত্য। আমরা এর আগেও মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) ছিলাম। যেহেতু তারা কষ্ট সহ্য করেছে তাই তাদেরকে দুইবার পুরস্কার দেওয়া হবে। তারা ভালো দ্বারা মন্দ প্রতিহত করে এবং তাদেরকে যান দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।’[সূরা কাসাস: ৫২-৫৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘তিন প্রকার ব্যক্তি রয়েছে যাদের দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে: আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি যে তার নবীর ওপর ঈমান এনেছিল এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত পেয়ে তাঁর উপরও ঈমান এনেছে ও তাঁর অনুসরণ করেছে...”

আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনবে না, সে কাফের এবং কাফেরের শাস্তি হলো জাহান্নাম:

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا

‘যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে না, আমি সেসব কাফেরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন (জাহান্নাম) প্রস্তুত করে রেখেছি।’[সূরা ফাতহ: ১৩]

নবীজি আরও বলেন: ‘সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, এই উম্মতের যে কেউ, সে ইহুদী হোক বা খ্রিষ্টান,

যদি আমার কথা শোনে এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তাতে ঈমান না এনে মারা যায়, তবে সে অবশ্যই জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’[সহীহ মুসলিম: ১৫৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ মাত্র। আল্লাহ তাঁকে যা শিখিয়েছেন তার বাইরে তিনি নিজে থেকে অদৃশ্যের খবর (গায়েব) জানেন না এবং নিজের বা অন্যের উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন না:

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“বলুন, আল্লাহ যা চান তা ছাড়া আমার নিজেরও কোনো উপকার বা ক্ষতি করার করতে পারি না। আমি যদি গায়েব জানতাম তবে অনেক কল্যাণ অর্জন করতাম এবং কোনো অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো কেবল মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।’[সূরা আরাফ: ১৮৮]

আল্লাহ তাঁকে ইসলামসহ পাঠিয়েছেন যেন একে সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

“তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন যেন একে সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।’[সূরা ফাতহ: ২৮]

রাসূলের দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া, আর হেদায়াত আল্লাহর হাতে:

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ

“যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (জানাবে,) আমি তো তোমাকে তাদের রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি। তোমার দায়িত্ব তো কেবল (বাণী) পৌঁছে দেওয়া।’[সূরা শূরা: ৪৮]

মানবজাতির প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান অবদান এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার সুবাদে আল্লাহ তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাদের তাঁর ওপর দরূদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাঁর) নবীর প্রতি দিরূদ পাঠ করেন; তাঁর ফেরেশতারাও তার উপর দরূদ পাঠ করেন। (অতএব) হে মুমিনগণ,

তোমরাও তাঁর উপর দরূদ পাঠ করো এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ করো।’[সূরা আহযাব: ৫৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীরা এই দ্বীন প্রচারের জন্য জিহাদ করেছেন। তাই আমাদের উচিত তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করা এবং তাঁর দেখানো পথে চলা:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও শেষ দিনের (সাক্ষাতের) আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তার জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম এক আদর্শ।’[সূরা আহযাব: ২১]

ইসলাম হলো স্বভাবজাত ও ন্যায়ের ধর্ম যা আল্লাহ মানবজাতির জন্য মনোনীত করেছেন। এটি আকিদা, ইবাদত, লেনদেন এবং আখলাকের সমন্বয়ে গঠিত। এই দ্বীনের অনুসরণ ছাড়া উম্মাহর মুক্তি নেই এবং আল্লাহ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করবেন না:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অন্বেষণ করলে তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’[সূরা আলে ইমরান: ৮৫]

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমনটি করেছিলেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

সূত্র: শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম আত-তুয়াইজরীর ‘উসূলুদ্দীনিল ইসলামী’।